আলোকিত তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু

গ্রন্থনায় : রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

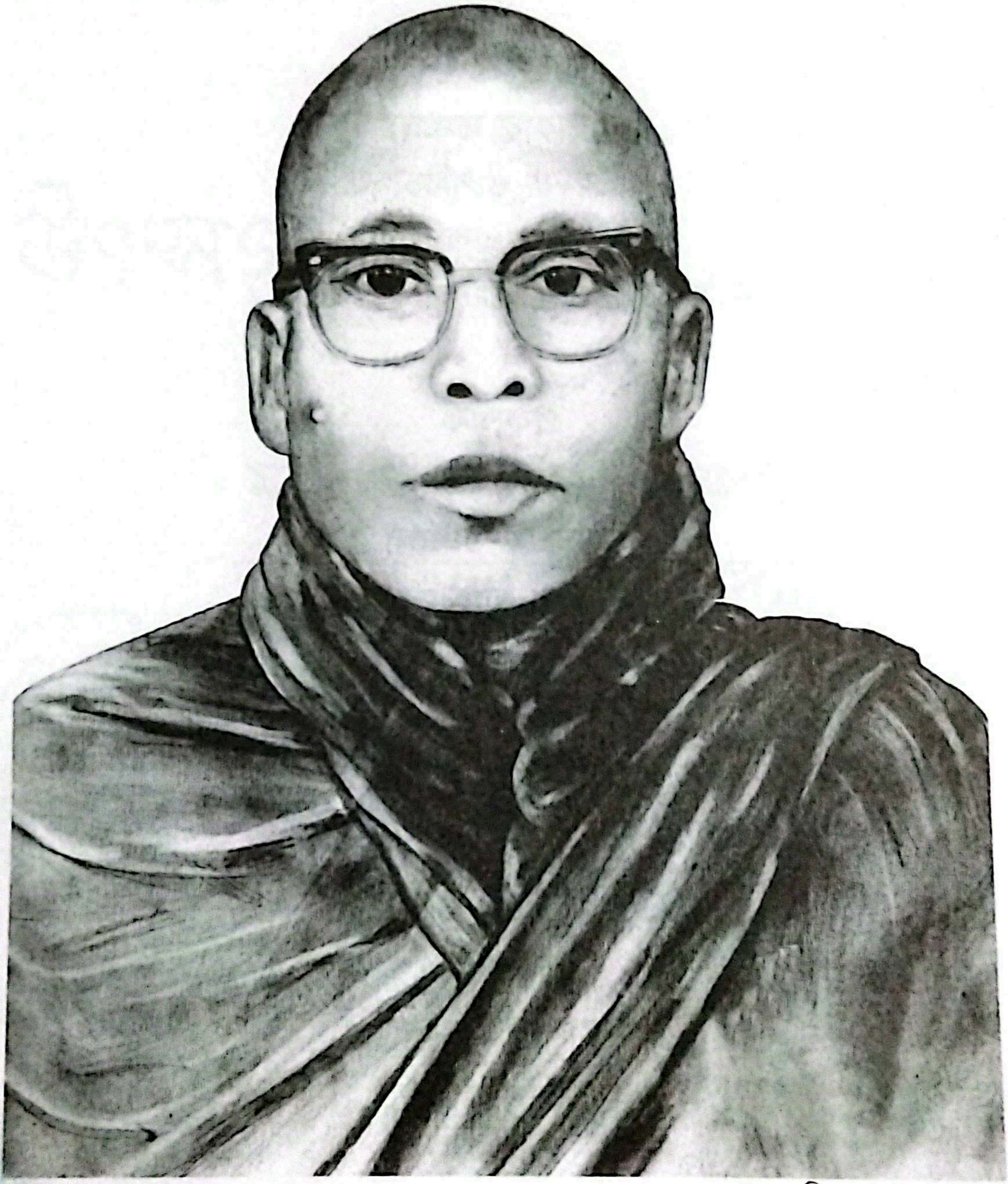

স্কেচ- রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা/৮১

রাজগুরু- শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির

ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক, অগ্‌গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজা

জন্ম- ১৯১৩ খ্রিঃ, মৃত্যু- ২০০৮ খ্রিঃ

আলোকিত তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু

গ্রন্থনায়--
রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
চারুকলা একাডেমী
কাঁঠালতলী, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশক
দিব্যেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা
অনুপম তঞ্চঙ্গ্যা
বালাঘাটা, বান্দরবান।

প্রকাশকাল
ফাল্গুনী পূর্ণিমা
১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
দিব্যেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা

ডিজাইন ও মুদ্রণে :
সীবলী অফসেট প্রেস
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি।
ফোন: ০৩৫১৬১৮৮২

উৎসর্গ

মা- হেনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা

দাদী- তন্যাপুরী তঞ্চঙ্গ্যা

== শ্রদ্ধাবণতচিত্তে

দিব্যেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা

অনুপম তঞ্চঙ্গ্যা

অবতরনিকা

অতীতে আমাদের সমাজে গুণী ব্যক্তি জন্মে ছিলেন তা অতি সত্য। তখনকার সময়ে কাগজের পাতায় বা পুস্তকে লিখে রাখার মত এমন ব্যক্তি কেউ আবির্ভাব হয়নি। তাই সেসব হারিয়ে যাওয়া আলোকিত মানুষের জীবন কাহিনী আমাদের সম্পূর্ণ অজানা।

তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু সত্তর বছর আগে দেখেছি। সেসব গৃহত্যাগী ভিক্ষুদের মধ্যে আমি ছয় জনকে নির্ণয় করেছি তাদের সেবা, দক্ষতা ও সদ্ধর্ম উন্নতি বিষয়াদি। কিন্তু সেই ছয়জন ভিক্ষু ইহলোকে নেই। সেবা আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা অর্জন করেছিলেন বহু খ্যাতি। দায়ক-দায়িকাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন- ধর্ম, শিক্ষা, মানবতা, সেবা এবং উন্নতি।

আমাদের লিখতে হবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে অতীতের কথা। নয়ত আগামী প্রজন্মের আমাদের লোকেরা জাতির চৌহদ্দি কি বর্ণনা দেবে ! আমাদের কথা আমাকে লিখতে হবে। আমরা শিক্ষা লাভ করেছি, আর শুনেছি বহু মনীষীদের জীবন কাহিনী। তাদের জীবনের আদর্শ থেকে আমরা অনুশীলন করি। তাই পরলোকগত স্মরণীয় ব্যক্তিদেরকে পুস্তকের পাতায় ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই।

গ্রন্থকার

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

তারিখ ঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমা
২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

আশীষ বাণী

১৯০৫ সালে চিংমরং ক্যাং প্রতিষ্ঠা করেন উমং চৌধুরী পিতামহ চন্দ্র চৌধুরী। এই ক্যাং প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তঞ্চঙ্গ্যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৬ সালে রাইংখ্যং এলাকার ছাক্রাছড়ি মৌজার তঞ্চঙ্গ্যা হেডম্যান শ্রী ভক্কলী আমু বগলতলী ক্যাং প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪১ সালে প্রথম কঠিন চীবর দান করেছিলেন। ১৯৪৫ সনে রাইংখ্যং নদীর তীরে কুতুবদিয়া মৌজায় প্রতিষ্ঠা করা হয় ক্যাং এবং সেখানে চুলামুনি নামে ২৫ ফুট উচু বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রতিবছর ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনদিনের মেলায় দূর দূরান্ত হাজার পুণ্যার্থীদের ভাত খাওয়ানো হত। ১৯৫৪-৫৬ সনে অনুষ্ঠিত হয় ২৫০০ তম বুদ্ধের জন্মজয়ন্তী। ব্রহ্মদেশে তিন বৎসর উদযাপিত হয় এই মহাসম্মেলন বা ষষ্টসংগীতি। গৌরবের বিষয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ১১৯ নং ভার্জাতলী মৌজার ধর্মপ্রাণ শ্রী মুক্তাধন কার্বারী অতি আড়ম্বের সাথে দিনটি পালন করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কাপ্তাই নদীর উপকণ্ঠে রাজস্থলী, হোয়াগ্‌গা বিভিন্ন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামে জাদিমেলা, বটবৃক্ষ উৎসর্গ, শামনী হওয়া, ওয়াঙ্গামা, ম্রাংডং ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অতীত কাল থেকে তঞ্চঙ্গ্যারা পালন করে আসছেন।

চিত্রশিল্পী, লেখক ও গবেষক রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা তাঁর বিভিন্ন পুস্তক বা রচনা থেকে জানা যায় তিনি লিখেছিলেন অতীতের স্মরণীয় দৃশ্যপট এবং বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনতথ্য। তাঁর লেখার মাধ্যমে যদি প্রতিফলিত নাহত কিংবা তার মনে কার্পন্যতা থাকত তাহলে আমাদের জাতির মধ্যে মৃত বা জীবিত এমন আলোকিত অনেকের জীবনচিত্র বিস্মৃতি হয়ে যেত। লেখকের এমন দূরদর্শিতা এবং সুচিন্তনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমি বাবু রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা ও তাঁর পরিজন সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির
সভাপতি
ত্রিরত্ন ভিক্ষু এসোশিয়েশন পার্বত্য চট্টগ্রাম।
রাজস্থলী, রাঙামাটি

তারিখ ঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমা
২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

শুভেচ্ছা বাণী

রাঙ্গামাটি চারুকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক চিত্রশিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য অঞ্চলের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত 'আলোকিত তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশ করতে যাচ্ছেন যেনে আমি আনন্দিত। তাঁর উদ্যোগটি সত্যিই খুবই প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি তাঁর এই উদ্যোগ অন্যদেরকেও অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং ভবিষ্যৎ তঞ্চঙ্গ্যা জাতির জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

তাঁর এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

রণজিৎ কুমার দেওয়ান
(চিত্রশিল্পী চুনিলাল দেওয়ানের জ্যেষ্ঠপুত্র)
সাহিত্য কর্মী, রাঙামাটি।

ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম

বুদ্ধের পরিনির্বানের পর সুদীর্ঘ দশ শতাধিক বৎসর যাবৎ ভারত ও তৎপার্শ্ববর্তী কিছু দেশ সমূহ মহান উদারতার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক মহামনীষী ফা-হিয়েন (৩৭৫-৪১৩খ্রিঃ) তাঁর দলবল নিয়ে ভারত পরিভ্রমণে আসেন। ভারত সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও শিল্পকলা দ্রুত উন্নতির অভিজ্ঞতা তার বিখ্যাত ফো-বি-কি গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। এরপর মহামনীষী হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খ্রিঃ ধর্ম সংস্কৃতি ও আইন নিয়ে ৭৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। কালক্রমে শক, হুন মোগল, পাঠান, কুশান ও পহলব জাতির এক একটি শাসনাধীনে বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে ম্লান হয়ে যায়। কাশ্মিরাধিপতি মিহিরগুল গান্ধার আক্রমণ করে সমস্ত বৌদ্ধস্তুপ সমূহ উৎপাটিত করেন। বহু সংঘারাম ধ্বংস করে ৬০ লাখ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের যম ভবনে প্রেরণ করেন। রাজা পুষ্যমিত্র অর্হৎ সহ বহু ভিক্ষু শ্রমনকে হত্যা ও বৌদ্ধকীর্তি ধ্বংস করেন। ৭৫০ খ্রিঃ কুমারিল ভট্ট পাশবিকতার অত্যাচার ও সনাতন ধর্মে দীক্ষিত হবার বাধ্য করেন। শিলাদিত্যের রাজত্বের পর শংকরাচার্য্যের প্ররোচনায় গয়া, সারনাথসহ বহু প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন ধ্বংস হয়। অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশিলা, উদয়পুর, সাচি, রাঁচি, নালন্দা, অবন্তী, রাজগীর, জগয্যোপেটা ইত্যাদি সহ মহাস্থানগড়, শালবন, ময়নামতি সহ শত শত জানা অজানা বৌদ্ধবিহার শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ধ্বংসে পরিণত হয়। শত শত বৌদ্ধধর্মে অনুসারী নর-নারী খুন, বন্দি, চুরি, অগ্নিসংযোগ এবং অসংখ্য ধর্মীয় পুস্তক পুড়ে দেয়া হয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি অমানুষিক আচরনে বিশ্বের বহু দেশ হতে দার্শনিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, পরিব্রাজক ভারত পরিদর্শন করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে ইউরোপের জনৈক পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার নাম করণ করা হয় ভিক্ষু নারদ, স্কটল্যান্ডের মিঃ জে, এফ মেকেলা (ওরফে ভিক্ষু শীলাচার), লন্ডনের ক্রিষ্টমাস

হুম্প্রেস (ওরফে তিথিল মহাথের), বিশ্বে সুপরিচিত ব্যক্তি। তাঁরা বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে অত্যাচারের প্রতিবাদ তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচার ও বৌদ্ধ মিশন গঠন করেন। মেজর টিটো, কে, জে স্যান্দ্রেস, চুনহলা অং (ব্রহ্মদেশ), ডঃ এম, আর সফট, ডঃ কুর্ট সীডট বৌদ্ধ সভ্যতা ও ধ্বংসের রূপরেখা পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করেন। ভারত ও সিংহল থেকে কুমার জীব, সংঘভুতি, গৌতম সংঘদেব, বিমলাক্ষ, বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মযশ, গুনবর্মা, জীনগুপ্ত, পরমার্থ, প্রভাকর মিত্র, বজ্রমিত্র, দানশ্রী, বিমলা-মত্র, জিনমিত্র, মঞ্জুঘোষ, শীলভদ্র ও রত্নাকর শান্তি চীন সহ বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং সাহিত্য দর্শন ধর্ম সাধনা বিজ্ঞান শিল্পকলাসহ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। চীনে মহামনীষীদের ভিন্ন ভিন্ন গমনে ঐ সময় ৫৪০০টি বৌদ্ধধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম পরিপূর্ণতা লাভের পর জাপানেও দ্রুত বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী কালে সিংহলের মহাপ্রাণ ডন ডেভিও (অনাগারিক ধর্মপাল) ৩১শে মে ১৮৯১ খ্রিঃ কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি প্রতিস্থাপিত করেন। তিনি মৌলবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের মোহান্তদের নিকট থেকে বুদ্ধগয়া সারনাথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান উদ্ধারের মহান সৎকর্ম সাধনাদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান গমন করেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভা দিয়ে বৌদ্ধকীর্তি উদ্ধার ও সংস্কারের অবদান অপরিসীম এবং নিরলস সংগ্রাম মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত চালিয়ে যান।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম জাগরণ

অনাগারিক ধর্মপালের উত্তরসুরি হিসাবে চট্টগ্রাম জেলারই জাতি বরেণ্য কৃতি সন্তান ডঃ বেনীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮– ১৯৪৮)খিঃ বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের বৌদ্ধ সাহিত্য অনুবাদসহ ইংরেজীতে ২১টি, বাংলায় ১২টি দুর্লভ পুস্তক প্রকাশনা করে বৌদ্ধ জাতির গৌরব অক্ষুন্ন ভাবে বজায় রেখেছিলেন। সারিপুত্র ও মৌদগলায়নের

পুত অস্থিখন্ড নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বৌদ্ধ সাহিত্যে পঠন পাঠকের প্রচার উৎকর্ষ সাধন মানসে তার এক ভগ্নাংশও জনসাধারন বা শিক্ষা নিয়ামকদের মধ্যে দৃষ্টি হয়না। প্রাচীন শিলালিপি বিশ্লেষনে এবং বৌদ্ধ মন্দিরে হিন্দুদের মুর্তি স্থাপনের প্রতিবাদী ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া। তিনি কলিকাতা, সিংহল, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লক্ষৌ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে Extemal Examinar ছিলেন। চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়ের আরও মহাপ্রজ্ঞাবান উজ্জল নক্ষত্রদের শ্রীমৎ কৃপাচরণ মহাস্থবির ১৯০৭ সালে কলিকাতা ধর্মাংকুর বিহার থেকে পুস্তিকাকারে দ্বি-মাসিক "জগজ্যোতি" পত্রিকা প্রকাশিত করে সদ্ধর্মের বাণী দেশের নগরে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির সদ্ধর্ম আহরণের জন্য রেঙ্গুন গমন করে বার্মীজ ভাষায় পুস্তক বঙ্গানুবাদ করে বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা করেন এবং "সংঘ শক্তি" নামে বাংলায় পত্রিকা নিয়মিত বের করেন। চট্টগ্রামের বড়ুয়া জাতিদের মধ্যে বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ পূণ্যাচার মহাস্থবির, ত্রিপিটকাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির, শ্রীমৎ গুণালংকার মহাস্থবির, মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির, সংঘনায়ক শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির, সংঘনায়ক শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির সহ বহু শীলবান পন্ডিত ধর্মসাধনা ও কঠোর আত্মত্যাগের অবদান রয়েছে। এসব মহান ব্যক্তিদের প্রচেষ্ঠায় গড়ে ওঠে বৌদ্ধ বিহার, মিশন, বিদ্যালয়, ভাবনাকেন্দ্র এবং দিয়েছিলেন রাশি রাশি ধর্মীয় পুস্তক।

ভুতপূর্ব অধ্যক্ষ ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী এম এ মহোদয় তার চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম পুস্তকের মতে, রাজা নগরে নিবাসী কবি ফুল চন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন। রাণী কালিন্দীর বিশ্বস্থ ও পরামর্শ দাতা। রাণীমাকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের প্রচেষ্ঠা তার সাফল্যতা ছিল বলে জানা যায়। তখন আরাকান নিবাসী মহাধর্ম রাজাধিরাজ সারমেধ মহাস্থবির সীতাকুন্ডে ধ্যান সাধনা করছিলেন। তাঁকে আমন্ত্রণ পূর্বক রাজানগর চাকমা

যশস্বিনী রাণী কালিন্দী রাজপ্রাসাদে আনয়ন করা হয় এবং ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহামুনি মন্দির নির্মাণ করেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বিনয়কর্ম উপযোগী ভিক্ষুগণের সমভিব্যবহারে বিনয়কর্ম সম্পাদন করে ভিক্ষু সংঘ নাম হয় "সংঘরাজ নিকায়" এবং আচার্য সারমেধ হলেন সংঘরাজ। একমাত্র এই "সংঘরাজ নিকায়" শাসন থাকবে অপরিবর্তিত, অবিভক্ত অন্য দল নহে। সেই সূচনা ধরে অর্থাৎ মহাপ্রজ্ঞাবান ধর্মগুরু সারমেধ মহাস্থবিরের পরবর্তী একশত বছরের পর আবির্ভূত হলেন ভিক্ষু অগ্রবংশ। রাণী কালিন্দীর মৃত্যুর বহু বছর পর জননন্দিত চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায় শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড) থেকে ১৯৩১ সালে অষ্টধাতু নির্মিত, সুবৃহৎ একটি বুদ্ধমূর্তি আনয়ন করেন। সেটি কর্ণফুলি নদীর পূর্বতীরে রাঙ্গামাটি মৌজার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গৌতমমুনি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পাশে ভিক্ষু বা পুরোহিত থাকার জন্য বাঁশের বেড়ার ক্যাংঘর। আমি গৌতমমুনি মন্দিরে রাজ পূণ্যাহ মেলায় ১৯৫২ ইং প্রথমবার গিয়েছি। ক্যাংঘরে মগ ভিক্ষু বা চট্টগ্রাম থেকে আগত বড়ুয়া ভিক্ষু ও শ্রমণ অবস্থান করতেন। তারা বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে ঘরের দুয়ারে চাইভিং বা কাঁসা বাজিয়ে চাউল, টাকা ভিক্ষা করতেন। সাথে একজন কারাগা বা সাহায্যকারী। ১৯৬০ইং এর আগে ভিক্ষুদেরকে গ্রামের লোকেরা তিরস্কার দিত এমন ঘটনা শুনেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলে লুরী পুরোহিত

লুরী/রাউলীদের পাঁচটি গোষ্ঠী– জধরা রাউলী, থান রাউলী, খুইদ্যা রাউলী, চান রাউলী ও ধমা রাউলী নামে পুরোহিতরা ভিক্ষা করতে, দিনমজুরী করতে আমি বহু আগের বহু দেখেছি। মুন্ডিত মস্তক। হলুদ রঙের ছোট এক প্রস্থ গামছা পিছনে গুচ দিয়ে পরিধান করতেন। গলায় রুদ্রাক্ষমালা, বাহুতে তাবিজ, কাঁধে নোংরা থলে বা পুতলী। তাদের ধর্ম পুস্তকের নাম আগরতারা। তাদের মতে রুলী বা রাউলীরা হচ্ছেন ভিক্ষুদের চেয়ে জ্যেষ্ঠতায় ও শীল ভাবনায় অনেক

বড় এবং তারা বুদ্ধপুত্র রাহুলের বংশধর। অস্পষ্ট ও অবোধ্য ভাষায় মন্ত্রপাত করে বিভিন্ন রকমের ফি দশা নিরুপন বা নিবারন করার জন্য স্বজাতির কাছে পূর্ণ সর্মথন লাভ করে থাকেন। একারণে লুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও এরা অশিক্ষিত অনাচারী, আর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে কঠিন মতানৈক্যতা ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এগারটি ভাষাভাষী আদিবাসী জাতির মধ্যে চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কথিত আছে অতীতে তঞ্চঙ্গ্যাগণ ব্রহ্মদেশে রোয়াংরাজ্যে (আরাকান) বৌদ্ধ জাতির সাথে বসবাসের ফলে তাদের ধর্মাচরণ ছিল বৌদ্ধ। যার কারণে মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ধর্মীয় সংস্কার কিছু কিছু মিল রয়েছে আর লেখাপড়া শিক্ষায় এখনও পিছিয়ে। অন্যদিকে চট্টগ্রামে বসবাসরত একই জাতি গোষ্ঠীরা মোঘলের আনুগত্যতা লাভ করেন। তাদের রাজা জব্বর খাঁ ছিলেন বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী শংকরাচার্যের অনুসারী বলে কথিত রয়েছে। তাঁর শাসনামল থেকে নরদস্যু ম্মিজিলিক (কাপালিক) নামের লোকেরা ছদ্মবেশে বিচরণ করত এবং সুযোগ পেলে মানুষ ধরে নিয়ে যেত। (চাকমা জাতির ইতিহাস– বিরাজ মোহন দেওয়ান, পৃষ্ঠা-১২২)। প্রবীন সাহিত্যিক বাবু কুমুদ বিকাশ চাকমা সম্পাদকীয় পাতায় উল্লেখ করেছেন "রাণী কালিন্দী (১৮৩২–১৮৭৪ খ্রিঃ) শাসনামলে চাকমা রাজ্যে প্রজাবৃন্দসহ হীনযান (থেরবাদ) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেও মহাযান–হীনযান কোন যানও তখন পালন করতেন না, তান্ত্রিকধর্ম পালন করতেন। সেই ধর্মের পুরোহিত ছিলেন রাউলী নামে চাকমাদের ধর্মীয় গুরু"। রাণী কালিন্দী শাসনামলে পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা ভিক্ষু ছিলেন কিনা কিংবা কত সন থেকে ভিক্ষু হয়েছিলেন তার নাম, সন, জাতি তা স্পষ্ট নয়। পুস্তকের নাম– "চাকমা বুড্ডিস্ট টেম্পল ও ধর্মশালা বুদ্ধগয়া এর ইতিবৃত্ত"। (ভারতীয় অধ্যায় ও বাংলাদেশ অধ্যায়) মূল্য–৪০০ টাকা।

চাকমা সার্কেলে ভিক্ষু অগ্রবংশের আবির্ভাব

পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা সার্কেল ১৯৫৭ইং এর পর বৌদ্ধধর্ম অভূতপূর্ব জাগরণ, পরিশুদ্ধতা একই ভাবে আয়ত্তকরন এবং প্রসার লাভ ভিক্ষু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের কঠিন ত্যাগ, সহিষ্ণুতায় সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। বাধার পর বাধা অতিক্রম করে জাতিকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তি মন্ত্রের জ্ঞানের আলো, ঢেলে দিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের সুধাসিঞ্চন। কারণ তৎসময়ে পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষিত ও বিনয়ধারী ভিক্ষু অভাব ছিল। অগ্রবংশ মহাস্থবিরের চিন্তা–চেতনা, অপরিসীম তত্ত্বজ্ঞান ও ধারণ এবং ধর্ম সমাজ প্রবৃদ্ধিকরণ বিষয়ে প্রবীন গুনী সমাজ তাঁকে ঠিক একশত বছর আগে মহা প্রজ্ঞাবান সারমেধ মহাস্থবিরের সাথে তুলনা করেছিলেন। অগ্রবংশ জন্ম হয় ১৯১৩ ইং সনে। জন্মের পর নাম রাখা হয় ফুলের মত সুন্দর বলে ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা। পিতা রুদ্রসিং কার্বারী ছিলেন মহাজন নামে খ্যাত এবং হাল চাষের জন্য অনেক মহিষ ছিল। মাতা ইচ্ছাবতী তঞ্চঙ্গ্যা। জন্ম স্থান- রাইংখ্যং নদীর ১২২নং কুতবদিয়া মৌজা, বিলাইছড়ি। ফুলনাথ মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে, তাঁর নাভির বর্ধিত অংশ বাম স্কন্ধে শোভিত ছিল। এই লক্ষণের নিমিত্ত ছিল ভবিষ্যতে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হবেন এমন পূর্বাভাস সবার মূখে মূখে। তার নাসিকার ডান পাশে এবং বক্ষের ডান পাশে জন্মলগ্ন থেকে দৃষ্টাদৃষ্ট ছিল বিদ্যান যশস্বী ও কবিত্বের চিহ্ন বড় লাল তিল। সুশ্রী মূলমন্ডল, ফর্সা এবং অতি বিমোহিত কণ্ঠস্বর। ফুলনাথের বয়স যখন বার চৌদ্দ ওসময় যাত্রা গানের পঞ্চম অংক নাটকে তিনি বিবেকের গান গেয়ে খুবই যশস্বী প্রাপ্ত হন। এ কারনে তাঁর সংসারের প্রতি অনাসক্তিভাব উৎপন্ন হয় এবং রাইংখ্যং নদীর তীরবর্তী ১২০ নং ছাক্রাছড়ি মৌজার বগলতলী বৌদ্ধ বিহারে শ্রীমৎ তিস্‌স মহাস্থবিরের নিকট প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে উপসম্পদাগ্রহণ করে নাম করণ হয় ভিক্ষু অগ্রবংশ। বলাবাহুল্য এই বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয় ১৯৩১ সালে এবং এই বিহারে কঠিন চীবর দান হয়েছিল ১৯৪১

সালে। সম্ভবত পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের এটাই সর্ব প্রথম কঠিন চীবর দান। ইহাও সত্য যে, ভিক্ষু অগ্রবংশ স্থবির রাঙামাটি চাকমা রাজবিহারে অবস্থানের পর ১৯৫৮ সালে প্রথম কঠিন চীবর দান করে এলাকার মানুষকে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। ১৯৪৩ ইং সালে রাঙ্গুনীয়া ধাতুচৈত্য বিহারে পন্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাস্থবিরের নিকট পালি শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আন্ধার মাণিক শ্মশান বিহারের সাধক প্রবর ও বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির (পরবর্তীতে নিখিল ভারত বৌদ্ধ সোসাইটি এর সভাপতি, দিল্লী) নিকট অভিধর্ম বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করেন।

১৯৪৮ ইং রেঙ্গুন গমন করেন এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৪-১৯৫৬ইং সালে তথাগতের আড়াই হাজার বর্ষপুর্তি বা বুদ্ধ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন, ষষ্ট সংগীতিতে রাষ্ট্রীয় পূর্ণ মর্যাদায় আমন্ত্রিত হয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম থেকে একমাত্র তিনিই অংশ গ্রহণ করেন। (The chatta sansayna souvenir Album, Union Buddha sasana Council,Yesu rangoon-17th may 1954 CE. অতঃপর ষষ্ট সংগীতি কারক বা অগ্রমহাপন্ডিত ভূষিত হওয়া এমন সৌভাগ্যবান হলেন ভিক্ষু অগ্রবংশ। তার মহাযাত্রা, সাফল্যতার সংবাদ দেশে বিদেশে সংবাদপত্রে ছাপা হয়। সে সময়কালে এই অঞ্চলে যেমনি শিক্ষিত ভিক্ষু ছিলনা তেমনি ভিক্ষুও ছিল অতি কম। ফলে লুরী/রাউলী বা লুথাক নামে পুরোহিতগণ প্রভুত্ব খাটিয়ে শাস্ত্র বিগর্হিত অনাচারে ঢেকে রেখে বহুলোক খৃষ্টান ও সনাতন ধর্মে দীক্ষিত হয়। অতঃপর চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায় সমাজের বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন। প্রবীন নেতা শ্রী কামিনী মোহন দেওয়ান ভূতপূর্ব এম,এল,এ, রায় বাহাদুর বিরুপাক্ষ রায়, বিরাজ মোহন দেওয়ান, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলভদ্র তালুকদার, সুবিমল দেওয়ান, হেডম্যান কমিটির সভাপতি শশাঙ্ক কুমার দেওয়ান, কৃষ্ণ মোহন

খীসা (মহাজন), ১নং ধামাইছড়া মৌজার নিরঞ্জন কার্বারী, দুরছড়ী দ্রোন কার্বারী, বন্দুকভাঙ্গা মৌজার ধর্ম মোহন কার্বারী, বন্দুভাঙ্গা মৌজার সেলশছড়ী গোকুল কার্বারী, লংগদু তিনটিলা মৌজার হেডম্যান হংসধ্বজ চাকমা, রাঙামাটি তুষ্টমনি চাকমা ও চিত্রগুপ্ত চাকমাসহ বিশিষ্ট সমাজ হিতৈষীদের সুপরামর্শ করেন। অতপর চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় রেঙ্গুন গমন করেন এবং ভিক্ষু অগ্রবংশ স্থবিরকে ফাং (আমন্ত্রণ) জানান। ১৯৫৭ইং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৫ই জানুয়ারী ১৯৫৮ ইং মহাআড়ম্বরে ও রাজকীয় সম্মানে "রাজগুরু" পদে অভিষিক্ত করেন। সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহন পূর্বক তাকে সমস্ত রাঙ্গামাটি প্রদক্ষিন করা হয়। তখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শত শত নর- নারী সাধুবাদ ধ্বনিতে মূখরিত ছিল। ব্যান্ডদল, কীর্তনপার্টি, ঢুলিদের ঢাক ঢক্কা, কাঁসর বাজনা আর রাস্তার দুধার পুষ্প ছিটিয়ে দেয়ার দৃশ্য খুবই আকর্ষনীয়। লাল বাহাদুর ও ফুলকুমারী নামে দুটি হাতি। একটির পিঠে রাজগুরু অগ্রবংশ স্থবির, অপরটির পিঠে রাজা ত্রিদিব রায় ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এইচ.ডি চৌধুরী সি.এস.পি।

সদ্ধর্ম জাগরণ ও উন্নয়ন

১৮৫৭ সালে চট্টগ্রামের রাজানগরে চাকমা রাণী কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় ভিক্ষু সারমেধ মহাস্থবিরকে রাজকীয় সম্মানে যেভাবে অভিষেক দিয়ে সংঘরাজ পদে ভূষিত করেছিলেন তার পরবর্তী ঠিক একশত বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে পুরানো রাঙ্গামাটি রাজমন্দির আঙ্গিনায় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট গুণী ভিক্ষু সম্মতিতে অগ্রবংশ স্থবিরকে "সংঘরাজ" পদে ভুষিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্থক জনম মহান এই ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম প্রচার, দীক্ষাদান, শাসননীতি এবং অবিভক্ত সংঘরাজ নিকায় তাঁরই শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯৫৮ সালে পুরাতন রাজবিহার থেকে ভিক্ষু শ্রামণগণ রাঙামাটি শহরে সর্ব প্রথম পিন্ডচারন শুরু করেন সুশৃঙ্খল ভাবে। ১৯৫৮/৫৯ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি"

প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতি" গঠন করেন। তাঁর নিরলস ও দুরূহ কর্ম প্রচেষ্ঠায় নির্মিত হল ছাত্রাবাস। অনাথ দুস্থ ছাত্র পড়া লেখায় শিক্ষিত হতে লাগল। তাঁর অচ্যুতানন্দ ও কোন্ডান্য নামে সাত বৎসরের প্রথম দুই বিজ্ঞ শ্রামণ বিভিন্ন ধর্ম সভায় ধর্মীয় গাথা পাঠ করে মানুষকে মুগ্ধ করে শ্রদ্ধা অশ্রু ফেলে দিত। পূজা পদ্ধতি, গাঁথা, সুত্রপাঠ, শীল আচারণ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ ও শ্রুতিমধুর সুরে বলার আয়ত্তকরণ একমাত্র ভিক্ষু অগ্রবংশের মহৎ অবদান। আচরণ দক্ষতা লাভ করে শ্রমণ ভিক্ষু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হতে শুরু করল। কঠিন চীবর দান, অষ্টপরিস্কার দান, সংঘদান ইত্যাদি সহ বুদ্ধ পূজা, সীবলী পূজা, কল্পতরু যাবতীয় পূণ্যকর্ম একমাত্র তাঁরই অবদান। শিশু কিশোরদের জন্য বাংলায় পুষ্প পূজা, প্রদীপ পূজা, বন্দনা, গাথা বা গীতি কবিতা, উদ্বোধনী সঙ্গীত ইত্যাদি পুস্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করেছিলেন। এছাড়াও চাকমা ভাষায় বুদ্ধ বন্দনা, গুরু বন্দনা, সূত্র এবং শীল পদ্ধতি, উৎসর্গ আর আচরণ বিধি সৃষ্টি করে মানুষকে দিয়েছিলেন অভূতপূর্ব সম্যকজ্ঞান। উল্লেখযোগ্য ধর্মসভা, ধর্মীয় উৎসব এবং পূর্ণ্যকর্ম মানুষ দেখতে পেল, সম্প্রসারিত হতে লাগল বৌদ্ধধর্মের নতুন জাগরণ। ওঝা, বৈদ্য, রাউলীদের ধর্মকাম, গাং পূজা, ভূতপূজা, থানমানা, ফি-দশা ইত্যাদি নিরুপন বা নিবারন নামে মিথ্যাদৃষ্টি বা অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করে সেবা, দয়া, মানবতা এবং স্বদ্ধর্মকে ধারন করল। ৩৩৪নং কুক্যাছড়ি মৌজার "খ্যাং জাতির নেতা মংবু মাষ্টার প্রবজ্যা গ্রহণ করলেন। ১১৯ নং ভাজ্যাতলী মৌজার হেডম্যান ~~খ্যাং~~ মুরং সর্দার হৃদয় রঞ্জন রোয়াজা দল নিয়ে এলেন রাজগুরু অগ্রবংশের পাদতীর্থে। কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা জাতি, খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী আর শিবধর্মের পূজারী এলেন বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা নিতে। উদ্ভব হল দশশীল ধারী সাধুমা নামে ভিক্ষুনী। অবশ্য মগ জাতির সাধুমা বহু আগে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। তারা তাদের মগ ক্যাং পাশে অবস্থান করতেন। আমার দেখা মতে,

ভৈরব তালুকদারের পত্নী, কালাবীমা, কদম্বমা, বান্দরীমা, রুক্সিনী-মা, রজনী বালা, বুড়িমা সহ আরও কয়েকজন পুণ্যবর্তী ব্রহ্মচারিনী সাধুমা সেবা সাধনা করে জীবনধন্য করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তক, সমবায় বুদ্ধোপাসনা, পরিনাম (নাটক), শ্রামণ্য কর্তব্য, চাংমা কদান্দী মঙ্গঁল সূত্র সহ ৬টি রাজ বিহারে এবং পরবর্তীতে বিদর্শন ভাবনা ও বুদ্ধ সামন্তিকা– ১ম খন্ড প্রকাশ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে সর্ব প্রথম স্মারক– "শুভবাণী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ ইং। এছাড়াও বিভিন্ন সংকলনে বহু লেখা এবং বোধি ভারতী, নালন্দা, পারমী, কৃষ্টি, পার্বত্য বাণী সহ বহু সংকলনে নিয়মিত লেখক। তিনি বাংলা, পালি, সংস্কৃতি, বার্মা ও ইংরেজী ভাষা জানতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ইং রাষ্ট্র মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান রাঙামাটি আগমণ করেন। বিশাল জনসমুদ্র এই সভায় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করেন। সদ্ধর্মের জন্য তিনি গিয়েছিলেন মাইলের পর মাইল উঁচু নিচু পথ হেঁটে। তখনকার সময়ে গাড়ী ছিলনা, ইঞ্জিন চালিত বোট ছিল শুধুমাত্র কর্ণফুলি নদীতে ছোট নৌকায় বসে গিয়েছিলেন রাত দিন। চেঙ্গী, মাইনী, ঠেগা, কাচালং, ভূষণচড়া, কাটলী, পাবলাখালী, রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ি, ঠেগা, জুরছড়ি, বরকল, হ্মান্যাচর, মহালছড়ি, বালুখালী, মগবান, সুবলং ইত্যাদি উজান বেয়ে। কাউখা-লী, রস্যাবিল, বন্দুকভাঙ্গা ইত্যাদি সহ বহু গ্রামে। এই ছাড়া ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ্য মযার্দায় বক্তব্য রাখতেন। চট্টগ্রামে তাঁর অনেক ত্রিপিটকধারী পন্ডিত ও শীলবান সতীর্থ ভিক্ষু রয়েছেন। তিনি মাইনী উপত্যকা দিঘীনালায় ১৯৬২ সালে শ্রমণ রথীন্দ্রকে কর্মবাক্য পাঠ করে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। নাম দিলেন ভিক্ষু সাধনানন্দ (বনভান্তে)।

<u>সেবাই পরম ধর্ম</u>

মহাসংঘনায়ক বরণ উৎসব

ভিক্ষু অগ্রবংশ স্থবির তাঁর ভিক্ষুত্ব জীবন বিশ বর্ষ (ওয়া) পূর্ণ হলে মহাস্থবির বা মহাসংঘনায়ক পদে বরণ উপলক্ষে কমিটি গঠন করা হয়।

১। শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন দেওয়ান (ভূতপূর্ব এম এল এ) সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত তুষ্টমনি চাকমা সহ-সভাপতি
৩। শ্রীযুক্ত শৈলেশ কান্তি বড়ুয়া সম্পাদক
৪। শ্রীযুক্ত সনৎ কান্তি বড়ুয়া সহ সম্পাদক
৫। শ্রীযুক্ত চিত্র গুপ্ত চাকমা সহ সম্পাদক
৬। শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দেওয়ান কোষাধ্যক্ষ
৭। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল চাকমা সদস্য
৮। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাল চাকমা সদস্য
৯। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র লাল চাকমা সদস্য
১০। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দেওয়ান সদস্য
১১। শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার চাকমা সদস্য
১২। অশ্বিনী কুমার চাকমা সদস্য
১৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল কুমার বড়ুয়া সদস্য
১৪। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান সদস্য
১৫। শ্রীযুক্ত সুকুমার বড়ুয়া সদস্য
১৬। শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার কার্বারী সদস্য

পৃষ্ঠপোষক বৃন্দ ঃ

১। মেজর রাজা ত্রিদিব রায় চাকমা রাজা {প্রধান পৃষ্ঠপোষক}
২। মং রাজা
৩। বোমাং রাজা
৪। রায় বাহদুর বিরুপাক্ষ রায়
৫। শ্রীযুক্ত বলভদ্র তালুকদার (অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট)
৬। শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ মুৎসদ্দী (ডিষ্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার)

৭। শ্রীযুক্ত শশাংক কুমার দেওয়ান (হেডম্যান)
৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মোহন খীসা (মহাজন)
৯। শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় খীসা (অগ্রগতি নেভিকেশান কোম্পানী সত্ত্বাধিকারী)
১০। শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র চাকমা (কন্ট্রাক্টর)

রাজ বিহার ২৬ শে চৈত্র, ১৩৭১ বাংলা, রাঙ্গামাটি ২৫০৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ।

মহাস্থবির বরণ উপলক্ষে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী কীর্তি নিধিবিস্তা সহ বার্মা, জাপান, জার্মান রাষ্ট্রদূত (সস্ত্রীক) আর চট্টগ্রাম সহ দেশের গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সময়ে রাজ পরিবারের চাকমা সলিল রায় রচিত **"বুদ্ধের স্মরণে জাগি"** নাটক মঞ্চস্থ হয়। এতে রাজ কুমারী সহ রাজ পরিবারের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করে নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়।

আবার বিদেশ গমণ

রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নয়, সমতল চট্টগ্রামের ভিক্ষু সমিতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে খুবই প্রয়োজন ছিল বলে আমন্ত্রিত হতেন। এমন কি ভারতেও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বড় বড় ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ১৯৭৩ ইং সনে ভারতে ভূবনেশ্বরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি সভাপতি হিসেবে পালি ভাষায় বক্তব্য করেন। কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি কেন্দ্রে নিখিল ভারত বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি একদিন সভাপতি হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৯৭৯ ইং সনে রাঙ্গামাটি রাজবিহার থেকে চলে যান কলিকাতা ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারে। সেখানে বসে ছিলেন না, বাংলায় ইংরেজীতে ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারতে অবস্থান রত চাকমাদের সাথে মিলিত হয়ে এবং শরণার্থী শিবিরে পূর্ণ সহযোগীতা করেছিলেন। তিনি জার্মান, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, জেনেভা যোগদান করেছিলেন। ভারতে দিল্লী, নেপাল ও থাইল্যান্ড সম্মেলন করেছিলেন। কর্মবীর ভিক্ষু বিমলতিষ্য মহাস্থবিরের পরিচালনায় কলিকাতার

অদূরে "বোধিচারিয়া স্কুল এন্ড কলেজ" স্থাপিত হয়। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তিনি ধর্মসং-গীতিকারক, ত্রিপিটক বিশোধক হিসাবে বিশ্ববৌদ্ধজাতির কাছে আরাধ্য। তাঁর জ্ঞান গরিমার প্রতি নিরীক্ষাকরতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক তাঁকে পালি পরীক্ষক হিসাবে যোগ্যতার সম্মান প্রদান করা হয়।

রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্র ও বৌদ্ধ সংস্থার সঙ্গে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধ জনগনের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন। Buddhists (Thailand), Mahabodhi Society (India), Kalinga Nippon Buddhist Sangha (Japan), Union Buddha Sasana Council (Burma), The Colombo youngmen's Budhist Association (Srilanka), The Burma Buddhist World Mission Burma), London Buddhist Society (London), All India Bengal Buddhist Association (India) এই সব সংগঠন বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি পর্য্যায়েও রাজগুরু ভান্তে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। তন্মধ্যে ১৯৬৪ সালে সিংহলের (শ্রীলংকা) প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৬৭ সালে প্রাপ্ত আমেরিকা যক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্রাবলীতে তাদের আগ্রহ, সহানুভূতি এবং সার্বিক সহায়তার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে সূত্রঃ শুভবাণী, রাঙ্গামাটি, ১৯৬৭ সাল।

বৌদ্ধ ধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি

জাতি, ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও শান্তি ঐক্যতার জন্য ভারতে ২৪ বৎছর অবস্থান করেছিলেন। দেশের মাটি ও মানুষের টানে পুনঃ রাঙ্গামাটিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সাথে এনেছিলেন ত্রিপিটকের দুর্লভ পুস্তকের অনুবাদ সহ নিজ হাতে

লিখিত বাংলা অক্ষরে তার পাভুলিপি সম্ভার। বাংলাদেশে অবস্থানরত বার্মা হাইকমিশনার এলেন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরকে লিখিত চিঠি দ্বারা আমন্ত্রন জানাতে। মায়ানমার (বার্মা) সরকার কতৃক আমন্ত্রনে অগ্রমহাপন্ডিত সংঘরাজ অগ্রবংশ মহাস্থবির পঞ্চাশ বৎসর পর আবার রেঙ্গুন গমন করলেন। মায়নমার সরকার রাষ্ট্রীয় পূর্ণ মর্যাদায় সংবর্ধিত করে **"অগ্গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজা"** উপাধিতে ভুষিত করেন। মহাযাত্রী মহাপ্রাণ তাঁর অন্তিম জীবনে বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ উপাধি লাভের জন্য দেশ, জাতি ধন্য ভিক্ষু অগ্রবংশ মহাস্থবির রাজকীয়ভাবে রাজগুরু পদ মর্যাদায় উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকলেও ২৪ বৎসরাধিক বাস করেছিলেন অতি ক্ষুদ্র পরিসীমায় যা সবার চোখে পড়ে। ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৮ ফুট প্রস্থ বাঁশের তৈরী তালি দেয়া ভাঙ্গা বেড়া, নিচে কাঁচা মাটির মেঝে, অপরিচ্ছন্ন পরিত্যাক্ত ছোট বারান্দা কক্ষ। পুরানো টিন দ্বারা ছাউনী চাল। বর্ষায় পানি পড়ে। বৃষ্টি পানির ছিটকা পড়ত ঘরের ভেতর। কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মসংযম, দৈন্যতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও তিনি সেই ঘরে বসে গভীর রাত অবধি লেখালেখিতে মগ্ন থাকতেন। বর্মী ভাষা ও পালি ভাষার ত্রিপিটক থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সে পান্ডুলিপি পুস্তক ছাঁপানোর পরিকল্পনা ছিল খুব বেশী। পঁচানব্বই বৎসর বয়স। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং শয্যাশায়ী হন। পরম শ্রদ্ধেয় ভান্তে পূণ্যে প্রভাবে বুঝতে পারলেন মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বুঝতে পারেননি তার জীবনে অনেক বৎসরের সাধনার ত্রিপিটকের বাংলা অনুবাদের রচনা পান্ডুলিপি সব খন্ড হারিয়ে যাবে।

৫ই জানুয়ারী ২০০৮ ইং রাত ৯-৩০- মিনিট মহাপ্রস্থান--------।

প্রাণহীন দেহ স্ফটিকের পেটিকাবদ্ধ করে সুসজ্জিত পালংকে রাখা হল একবছর। রাঙামাটি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে রাজগুরু অগ্রবংশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটিতে ছিলেন তিন পার্বত্য জেলার ৩ জন রাজা, জেলা পরিষদের ৩ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সংসদ সদস্য। সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ শতাধিক সদস্য।

০৪/০৫/০৬ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তিনদিন ব্যাপী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে লক্ষাধিক নর-নারীকে রাজবাড়ী এলাকা পরিপূর্ণ হল। নদী পারাপারের জন্য বড় পুল তৈরী হয়েছিল। দেশী-বিদেশী দেড় হাজার ভিক্ষু বসার মঞ্চ তৈরী হয়। সুদূর বান্দরবান জেলা থেকে মারমা কারুশিল্পীদের দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল ৫টি অতি আশ্চর্য, অপূর্ব সৌন্দর্য প্রাটাশ (স্বর্গারোহনের রথ)। লামা কক্সবাজার নৃতবাদ্য, নিজস্ব গীতিতে শরীর কসরৎ নৃত্যদল) নামে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দলীয় নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

"মরদেহ চলে গেছে, তুমি আছ বেঁচে,
তোমার বিরাট কীর্তি, আমাদের মাঝে।।"

কালাম সূত্র

শুনেছ বলে সব কথা বিশ্বাস করোনা। গুরুজন বলেছে, কিংবদন্তিতে আছে তা বিশ্বাস করো না। ধর্মগ্রন্থে লিখা আছে, বহু লোকের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে তাও সবকিছু বিশ্বাস করোনা। যদি নিজের এবং সকলের মহামঙ্গল হয় তাহা বিশ্বাস করবে এবং ধারণ করবে।

---- তথাগত বুদ্ধ

দার্শনিকদের অভিমত

** যাঁরা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, যাঁর হৃদয় মানবতাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় ভরা, যার রয়েছে সেবা মনোভাব ও সত্যবাদিতা তাঁদের কয়েক জনের উক্তিঃ---*

১। শ্রীমৎ শীল পাল ভিক্ষু, অধ্যক্ষ, চাকমা রাজ বিহার, রাঙ্গামাটি।

আমাদের সকলের একবাক্যে স্বকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ম পুনর্জাগরণে অগ্রনায়ক নির্বাণগামী পরম শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের ভান্তের অবদাণের কথা। শ্রদ্ধেয় ভান্তে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে যেভাবে অবদান রেখে গেছেন তা কখনো পার্বত্যবাসীর ভোলার নয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সৃজনশীল চিন্তাধারা ছিল বিধায় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে শ্রদ্ধেয় ভান্তের পক্ষে এসব করা সম্ভব হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধেয় ভান্তে ছিলেন সত্যিকারের একজন উদার মনোভাবাপন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর মনে ছিল অঢের সাহস। যা জীবনের অন্তিম মুহুর্ত পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। আমার চলমান জীবনে খুব কম সময়ই শ্রদ্ধেয় ভান্তের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। এই স্বল্প সময়ই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সময় বলে আমি মনে করি। কারণ একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত মহাপুরুষের জীবনের শেষ মুহুর্তটাই আমি লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। ভান্তের জীবনাদর্শ কম সময়ে আমি যতটুকুক দেখিছি এবং জেনেছি তা আমার জীবনে কখনো ভোলার নয়। শ্রদ্ধেয় ভান্তেকে দেখেছি বৃদ্ধাবস্থায় এসেও দৈনিক রুটিন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে। সেই সকাল থেকে উঠে রাত্রে শোয়ার আগ পর্যন্ত। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে প্রথমে বুদ্ধের সামনে বাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতেন তারপর নিজ আসনে বসে ভাবনায় রত থাকতেন যতক্ষন পর্যন্ত সকাল না হয়। সকালের নাস্তা সেরে কিছুক্ষণ হালকা বিশ্রাম

নিয়ে তারপর স্নান করতেন। সেটা হোক শীতকাল অথবা গরম কাল। বৃদ্ধাবস্থায়ও তিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা করতে পারতেন। স্নান কার্যাদি সম্পাদনের পর তিনি খাতা কলম ও বই এবং তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদি হাতে নিয়ে নিজ কক্ষ থেকে বাহির হতেন এবং তাঁর জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে কখনো মনের আনন্দে কখনো বা চিন্তিত মনে লিখতেন এবং পড়তেন। এর ফাঁকে তাঁকে দর্শন করতে আসা দায়ক-দায়িকাদের সাথে তিনি কথা বলতেন এবং ধর্মীয় দেশনা প্রদান করতেন। আমাদের সাথেও কথা বলতেন এবং ধর্ম কথা শোনাতেন। এভাবে তিনি পুরো দিনটাই কাটিয়ে দিতেন। সন্ধ্যা ৭.০০টা বা ৭.৩০ টার দিকে যদি কেউ পাশে না থাকে তাহলে ঘুমাবার জন্যে কক্ষে প্রবেশ করতেন। রাত ১.০০ টা বা রাত ২.০০ ঘটিকার মধ্যে তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধূয়ে আবার ভাবনায় রত থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ভোর না হয়। এই ছিল তার দৈনন্দিন জীবনের নীতি ও আদর্শ।

আমার এখনও মনে পড়ে ভান্তের সাথে শেষ মুহুর্তে বলা কথাগুলো কথা। ভান্তের ছিলো না কোন রোগ-ব্যাধি। ভান্তে মাঝে মাঝে বলতেন যদি মরতে হয় তাহলে এমনিতেই মরবো। যদি মরণের সময় আসে আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। তোমরা আমার জন্য তেমন চিন্তা করো না। হ্যা, সত্যিই তো যখন সময় এসেছে ভান্তেকে ইহকাল ছেড়ে পরপারে যেতে হয়েছে সেটি হলো বার্ধক্য জনিত কারণ। যে কারণটা মৃত্যুর ৫ দিন পূর্বেও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি রাত প্রায় ১.০০ ঘটিকার দিকে। সে দিন রাতে ঘুমের মাঝে আমি ভান্তের ডাক শুনতে পাই। ভান্তে আমাকে নাম ধরে ডাকছেন। ঘুম থেকে উঠে দেখি সত্যি সত্যি ভান্তে আমাকে ডাকছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি ভান্তের রুমের দরজায় গিয়ে ভান্তেকে ডাক দিলে ভান্তে রুমের ভিতর থেকে দরজাটা খুলে দিয়ে বলে উঠেন শীল পাল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমাকে ধরো। তারপর ভান্তেকে ধরে তাঁর বেডের উপর বসিয়ে সামান্য পানি পান

করালাম। তারপর দৌড়ে গিয়ে সুনন্দ শ্রামণ এবং প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণকে ডেকে আনলাম। তাদেরকে বললাম যে তোমরা ভান্তেকে দেখ আমি ডাক্তার ফোন করতে যাচ্ছি। তারপর আমি (বড়ুয়া ডাক্তার) ডাঃ নিহারেন্দু তালুকদারকে ফোন করার উদ্দেশ্যে ভান্তে রুম থেকে বের হয়ে যাই। ফোনে বিষয়টা অবগত হয়ে ডাঃ নিহারেন্দু বাবু আমাকে বন্দনা জানিয়ে বললেন যে, ভান্তে এখন তো রাত অনেক হয়েছে, তাছাড়া পারাপার হওয়ার ঘাটও বন্ধ হয়ে গেছে তাই আসা সম্ভব হবে না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে শ্রদ্ধেয় ভান্তেকে গরম পানি পান করানোর জন্য। তাই আমি ডাক্তার বাবুর সাথে আর কোন আলোচনা না করে রাজগুরু ভান্তের রুমে এসে প্রবেশ করলাম। শ্রামণদের বললাম যে ভান্তের জন্য তাড়াতাড়ি গরম পানি প্রস্তুত করতে। তারা আমাকে প্রত্যুত্তরে বললেন যে ভান্তে জন্যে রুমে ফ্লাস্কে গরম পানি সংরক্ষিত আছে। তাই আমি ভান্তেকে একটি গ্লাসে সামান্য গরম পানি পান করালাম। গরম পানি পান করাইয়া ভান্তের সামান্য উপকার হয়েছে এটা বুঝতে পেরে পুরো এক গ্লাস হরলিক্স গরম পানিতে করে আবার পান করালাম। এতে ভান্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, তখন ভান্তে খুব ভয় পাননি। এবং ভান্তে সুস্থ হয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন যে, মরতে হবে, (মরা পুরিবো) তারপর ভান্তেকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে, ভান্তে, আপনার এখন কেমন লাগছে? ভান্তে প্রত্যুত্তরে বললনে যে এখন ভাল লাগছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমাদের রুমে চলে যেতে বললেন। আমরা ভান্তেকে প্রার্থনা করলাম যে আবার ঘুমানোর জন্য। ভান্তে বললেন যে আমি আর ঘুমাবো না, বসে থাকবো। তোমরা এবার যেতে পারো। তারপর আমি শ্রামণদের বললাম যে, তোমরা রুমে যেও না। তোমরাও এখানে বসে থাক। সেদিন শ্রামণেরা ভান্তের সাথে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে রুমে ঘুমাতে গিয়েছিল। ভান্তে কিন্তু সেদিন আর ঘুমাননি। তিনি সারারাত ভাবনায় রত ছিলেন। তারপরদিন সকালে

ডাঃ নিহারেন্দু তালুকদার বিহারে এসে পৌছলেন এবং ভান্তেকে পরীক্ষা কিছু ঔষুধ লিখে দিলেন। দুই ধরণের ঔষুধ দিলেন এবং আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে এক ধরণের ঔষুধ সবসময় চলবে আর অন্যটি যদিআবার এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই ঔষুধটি খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এখানে একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। সেটি হলো- ডা. নিহারেন্দু তালুকদার ভান্তে অসুখের কথা শুনলে ভান্তেকে চিকিৎসা করতে দ্রুত ছুটে আসতেন। শ্রদ্ধেয় ভান্তের শরীরে কোন প্রকার অসুখ দেখা দিলে ডা. নিহারেন্দু তালুকদারকে খবর পাঠাতে-ন। তাই সেদিনও ভান্তে অসুখের কথা শুনে সকালে সোজা চলে এসেছেন বিহারে।

ঔষুধগুলো খাওয়ানোর দায়িত্ব শ্রামণদের হাতে দিলাম। কারণ তারা সবসময়ই ভান্তেকে সেবা করতো। এভাবে ৫দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় ভান্তে আবার একই ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ জানুযায়ী মাসের ৫ তারিখ রাত ৮.০০ ঘটিকার দিকে। সেদিন শ্রদ্ধেয় ভান্তে ছিলেন তাঁর নিজ কক্ষে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম ভান্তে আমাকে আবার আগের মতন করে ডাকছেন। শীল পাল.. শীলপাল... আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে"। প্রথমে এই কথা শুনেছিলাম। তারপর দৌড়ে এসে দেখি ভান্তে তাঁর নিজ আসনে বসে আছেন এবং গলা হতে কাশি দিয়ে কফ সাড়াবার চেষ্ট করছেন। ভান্তে পাশে এসে জানতে চাইলাম ভান্তে, আপনার কি আগের মতন করে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? ভান্তে মাথা নেড়ে হ্যাঁ উত্তর দিলেন। তখন আমি তাড়াতাড়ি ভান্তেকে পানি পান করানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেদিন ভান্তে পানি পান করতে রাজী হলেন না। তিনি আমাকে বললেন যে ঔষুধ খেতে হবে। ঔষুধ গুলো কোথায়? তখন আমি দৌড়ে গিয়ে শ্রামণদের ডেকে আনলাম। জানতে চাইলাম তাদের কাছ থেকে আজ ভান্তেকে ঔষুধ খাওয়ানোর হয়েছে কিনা? ওরা বললো যে হয়েছে। তারপরেও আমরা ভান্তেকে ঔষুধ খাওয়ালাম। তখনও ভান্তে তাঁর গলা হতে কফ সরাবার চেষ্টায় আছেন। ভান্তে

বার বার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন ভাবেই ভান্তে গলা হতে কফ সরাতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে ভান্তের বমি হচ্ছে। বমির সাথে কিছুক্ষণ আগে খাওয়ানো ঔষুধগুলোও বের হয়ে এসেছে। তারপর ভান্তে কাছে জানতে চাইলাম যে ডাক্তার ডাকবো কিনা? ভান্তে বললেন না, প্রয়োজন নেই। ভান্তে অবস্থা খারাপ হতে পারে অনুমান করে শ্রামণদেরকে দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে আমি বাইরে গিয়েছিলাম আবার ডাঃ নিহারেন্দু তালুকদারকে ফোন করতে। ডাক্তার বাবুর বাসায় ফোন করে জানতে পারলাম যে ডাক্তার বাবু বাসায় নেই। আমি ডাক্তার বাবুকে ফোন করতে গেলে ভান্তে শ্রামণদের বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ভান্তে নাকি বলেছিরেন যে, তোমরা আমার বুকে এসো এবং আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো (পরে জেনেছি)। আমি আবার ভান্তে রুমে ফিরে এসে ভান্তে কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম এখন কেমন লাগছে? ভান্তে উত্তরে বললেন যে, এখন আগের চেয়ে একটু বেশি হয়েছে। তাই আমি রাজ বিহারে অবস্থানরত সকল ভিক্ষু-শ্রামণ এবং ছাত্রদের ডাকলাম। সবাই মিলে আমরা প্রথমে হুইল চেয়ারে এবং পরে টেক্সিতে করে রাঙ্গামাটি সদর হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম। হসপিটালে গিয়ে ভান্তেকে প্রথম অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল। তার সাথে স্যালাইনও দেয়া হয়েছিল। শত চেষ্টার পরও ভান্তেকে সুস্থ করা আর সম্ভব হয়নি। রাত ৯.৩০ ঘটিকার দিকে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। এ সময় হসপিটালে উপস্থিত ছিলেন চাকমা রাজ বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুসংঘ, শ্রামণ ও ছাত্ররা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ বিহারে পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু মনিশংকর চাকমা, বাবু অক্ষয় কুমার চাকমাসহ আরও কয়েজন দায়ক এবং হসপিটালে স্টাফবৃন্দ।

৫ জানুয়ারি রাতের মধ্যে রাঙ্গামাটিসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং দেশের বাহিরে শোক সংবাদটি সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র বৌদ্ধদের মাঝে নেমে আসে শোকের ছায়া। এভাবেই জীবনের

পরিসমাপ্তি ঘটলো আমাদের সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের। পরিশেষে প্রয়াত রাজগুরু ভান্তের পরম শান্তি নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক-............ ।

২। ভিক্ষু তিলোকানন্দ মহাস্থবির, ভিক্ষু ওয়া বা বর্ষাবাস জুন ২০১৭ ইং সালে ৬০। সভাপতি প্রাক্তন পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ। প্রতিষ্ঠাতা কাচলং শিশু সদন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা টিভি চ্যানেল ATN বাংলা কর্তৃক প্রদত্ত "সাদা মনের মানুষ", স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ২০০৭ খ্রিঃ।

"ব্রহ্মদেশের(মিয়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুন শহরের কাবায়ে মহাপাষাননা গুহায় ভিক্ষু অগ্রবংশ ষষ্ঠ সংগীতি (১৯৫৪-৫৬খ্রিঃ) অংশ গ্রহণ করার পর ভিক্ষু অগ্রবংশ ষষ্ঠ সংগীতি কারক। চাকমা রাজ ত্রিদিব রায়ের আমন্ত্রণে তিনি ১৯৫৭ খ্রিঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর আগমনের পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে চাকমা সার্কেলে ছিলনা কঠিন চীবর দান, অষ্টপরিষ্কার দান,সংঘদান, বুদ্ধপূজা এমন কি ক্যাংঘর বা বৌদ্ধ বিহার ছিল না আর চাকমা ভিক্ষু ছিলনা। দানের মধ্যে ছিল শুধু পুদগলিক দান। ধর্মীয় কাজ সমাধা করা হয় রাউলী বা লুরী পুরোহিত কিংবা বৈদ্য দ্বারা। তখনকার সময়ে অর্থাৎ রাজগুরু ভান্তে পার্বত্য জেলায় আগমনের আগে আমাদের সমাজের লোকেরা ভিক্ষু শ্রামণ মোটেই প্রয়োজন মনে করতোনা এবং অধিকাংশ লোকেরা ভিক্ষু প্রণাম করতে জানতনা। ভিক্ষু দেখলে কুলক্ষণ মনে করত.............. ।"

৩। ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দ মহাথের এম এ প্রাক্তন সভাপতি মোনঘর, প্রতিষ্ঠাতা – আদিবাসী গ্রীন হার্টকলেজ, বনফুল ঢাকা।

"আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৌদ্ধ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পুনঃ জাগরণ অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন

রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের সাংঘিক ব্যক্তি হিসেবে যেমন অতুলনীয় তেমনি সমাজ, সদ্ধর্মসেবী হিসেবে অকুতোভয়, নিবেদিত প্রাণ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যিক হিসেবে ছিলেন অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর মত উদার, ত্যাগী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব সমাজে নেই বললে চলে। কর্মবীর ভিক্ষু বিমল তিষ্য মহাস্থবির এম এ এবং আমি তাঁর মত কর্মযোগী ও বিরল প্রতিভার সান্নিধ্য পেয়ে এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা গড়ে তুলতে পেরেছি জ্ঞানতীর্থ বিদ্যা নিকেতন। তিনি আমাদের কর্ণধার ও আলোকবর্তিকা। তাঁরই আর্শীবাদ পুষ্ট হয়ে জাতীয় আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে ঠাঁই করে নিতে পেরেছি, কৃতজ্ঞ স্বীকার করছি...............।"

৪। শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবির, সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, –

"আমার যৌবন বয়সের সময় আমি তাঁর সান্নিধ্য গিয়েছিলাম আগরতলা। সেখানে কিছুদিন থাকাকালীন তার যশঃ প্রতিপত্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে ....।"

৫। শ্রীমৎ এস ধর্মপাল মহাস্থবির, সংঘনায়ক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, –

"পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের সংঘনায়ক, প্রবীন ধর্মীয় গুরু অগ্রমহাপন্ডিত, বহু গ্রন্থপ্রনেতা, অগ্‌গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজ সারা জীবন বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, শাসন ও সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত ছিলেন। পাবর্ত্য অঞ্চলে বৌদ্ধধম জাগরণ ও উন্নয়ন একমাত্র তারই প্রচেষ্ঠার সার্থক হয়................।"

৬। ডঃ জিনবোধি ভিক্ষু, সহ অধ্যাপক, গবেষক, প্রাচ্যভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,

"রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির গৌরবদ্বীপ্ত একটি ইতিহাস, একটি মহাপ্রাণ সংমনীষী, একটি আদর্শ, একটি প্রতিষ্ঠান ও পূণ্যময় একটি নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সমাজ জাগরণে

বিশেষত থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রবাদ প্রতীম এবং প্রতিথযশা একজন সংঘপুরোধা ছিলেন তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত, তেজস্বী, অকুতোভয় এবং জ্ঞানতপস্বী সারা জীবন বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা, সাহিত্য সাধনা, অনুবাদ কার্য সম্পাদন, অনগ্রসর এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন পার্বত্য এলাকাকে জ্ঞানের দ্বীপ শিখায় একমাত্র তিনি আলোকিত ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রদূত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বলয়ে সাংগঠনিক কর্মকান্ড, স্বজাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর মুক্ত চিন্তা-চেতনা এবং দূরদৃষ্টি ছিল অভুতপূর্ব। প্রচন্ড উদ্যমশীলতা, অনুসন্ধিৎসু, সাহসী,স্বজাতি দরাদী দেবতুল্য সুপুরুষ বর্তমান সময়ে তুলনা করা যাবে না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদা সিধে, অনারম্ব জীবন, বিরতিহীন কর্মী, সদাসর্বদা প্রসন্ন, আন্তরিক হাস্যোজ্জল, ত্যাগী পরোপকারী, বহুমূখী প্রতিভার অত্যুজ্জল কৃতিবিদ এবং সংঘ পুরোধার যথার্থ মূল্যায়ন অন্ধজনের হিমালয় অতিক্রম তুল্য। ত্রয়োদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গণ নামে মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, খেতাবধারীদের দাপট ও কঠিন বাধায় নামে মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। নানা প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং রাউলী নামে ধর্মগুরু কার্যক্রম ছিল প্রবল। রাজগুরু অগ্রবংশ বার্মাদেশ রেঙ্গুন থেকে এসে পার্বত্য ভিক্ষু সমিতির মাধ্যমে সমগ্র পার্বত্য এলাকা গুলির বিশেষ করে চাকমা সার্কেলের গ্রামের বিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগতিায় বহু ক্যাং বা বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করে ভিক্ষু সংঘের মাধ্যমে বুদ্ধ পূজা, সংঘ পূজা, অষ্টপরিষ্কার দান, ত্রিরত্ন বন্দনা, শীল পালন ইত্যাদি মাঙ্গলিক কাজ উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রানিত করেন। তদুপরি বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা পালন আর বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু রাখার ব্যবস্থা ও তারই উপাধ্যায়ত্বে সমাজ সংস্কার ভুমিকা চলে আসছে.............।”

৭। কর্মবীর ভিক্ষু বিমলতিষ্য মহাস্থবির এম এ প্রতিষ্ঠাতা শিশু করুনা সংঘ, স্কুল এ্যান্ড কলেজ কলিকাতা ভারত–

"উঠো, জাগো, ঘুমিয়ে থেকোনা আর। সুচারুরূপে ধর্মাচারণ কর। যে অপ্রত্ত ভাবে ধর্মাচারণ করে ইহকাল ও পরকাল সুখের হয়। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের কণ্ঠে সেদিন শুনেছিলাম গাথায় মাধ্যমে এই প্রেরণা দায়ক আহবান। শুনতে শুনতে আমি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় অবিভুত হয়েছিলাম। বাহিরে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ ছিলনা। আমার দেহে শিহরণ অনুভব করলাম। এরূপ ধর্মদেশনা চাকমা ভাষায় জীবনে আর কখনও শুনিনি। অনর্গল ধর্মদেশনা করে যাচ্ছিলেন, স্তব্দ নতজানু দায়ক দায়িকা। সালটি মনে নেই, হয়ত ১৯৬১/৬২ ইং হবে, মাঘী পূর্ণিমা, স্থান বোয়ালখালী। মুন্ডিত মস্তক, সুন্দর সুঠাম দেহী, গৌরবর্ণের বৌদ্ধভিক্ষু অগ্রবংশ মহাথের। ষ্টেজের উপর দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে চাকমা ভাষায় এমন সুমধুর কণ্ঠে ধর্মদেশনা করেছিলেন যে, শতশত নর-নারী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিলেন। সেই অভুতপূর্ব ভাষণে সমগ্র মাইনী এলাকার আবাল- বৃদ্ধ- বনিতার মনে প্রাণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আর দেরি নয়, সেই দিনই রাজগুরু অগ্রবংশ মহস্থবিরের পাদতীর্থে দীক্ষা বা মহমন্ত্রোপদেশ নিলেন। ১৯৬২ ইং বৌদ্ধধর্মের অভিজ্ঞ ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদা প্রদান করা হয় শ্রমণ অতিন্দ্রকে। রাজগুরু অগ্রবংশ মহথের উপধ্যায়াতে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুসম্পন্ন হয় এই উপসম্পাদা অনুষ্ঠান। এই সাধক শ্রামণ সাধনায় নিমগ্ন থাকতে পছন্দ করেন বলে নাম করণ হয় সাধনানন্দ ভিক্ষু। তিনি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের অন্যতম শিষ্য.........।"

৮। ইতিহাসবিধ বিরাজ মোহন দেওয়ান, প্রনীত চাকমা জাতির ইতিহাস (বাংলা একাডেমী ঢাকা কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত) দাম ২৫০ টাকা। স্বত্বাধিকারী "পার্বত্য বাণী" পত্রিকা ১৯৬৭।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সামাজিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এককালে খুবই দুরবস্থা ছিল। শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন হইতে স্বদেশে আগমনের পর এক অদ্ভুদ নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। তখন থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি হয়.......... ।

৯। ডঃ জাফর আহমদ খান, জেলা প্রশাসক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা। তার প্রকাশিত দলিল পুস্তক "রাঙামাটি বৈচিত্রের ঐকতান" ২০০৪ খ্রিঃ দাম ৩৫০ টাকা।

শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের ১৯৪২ সনে উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সনে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করার জন্য বার্মা গমন করেন। তিনি রেঙ্গুনের কাসাইহেডা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পালি সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ত্রিপিটক বিশারদ উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৪-৫৬ সনে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত যষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে অন্যতম সংগীতিকারক হিসাবে যোগাদান করেন। তিনি ১৯৫৮ সনে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে তৎকালীন চাকমা রাজা কর্তৃক মহা জাকজমকপূর্ণ ভাবে রাজগুরু পদে বরণ করে নেয়া হয়। উল্লেখ্য ১৯৬১ সনে শ্রীমৎ সাধনানন্দ ভিক্ষু (বনভান্তে) কে উপসম্পদা প্রদানের সময় তারই নেতৃত্বে কর্মবাচ্য পাঠ করা হয়। তিনি ষাটের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। তিনি রাজগুরু হিসাবে রাঙামাটি রাজবিহারে ও ভারতে ধর্মাঙ্কুর বুড্ডিষ্ট টেম্পলে অবস্থান করেছিলেন......... ।

১০। ডঃ আশা দাশ, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, প্রাক্তন অধ্যাপক পালি ভাষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

"পালি ভাষায় মহাপন্ডিত, জ্ঞানতপস্বী রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দশ বৎসর পালি শাস্ত্র পড়েছি। পালি শাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করেছি। বাংলা গ্রন্থকে পালি ভাষায় অনুদিত করেছি কোনদিনই পঠন পাঠনে তাঁকে এতটুকু ক্লান্তিবোধ করতে দেখেনি। তিনি ছিলেন আমার পিতৃপ্রতিম শিক্ষাগুরু ও পথ প্রদর্শক জীবন কখনও থেমে থাকে না। জীবন মৃত্যুর হাত ধরাধরি করে চলে। মৃত্যু জীবনের ছন্দ পথন ঘটায়। পূজনীয় ভিক্ষু চাকমা রাজগুরু অগ্রাংশ মহাথের এর মৃত্যু আমার কাছে চিরকালের বেদনা। বৌদ্ধ জাতির অপূরনীয় ক্ষতি। তাই বেদনাদ্র হৃদয়ে তোমারে করি নমস্কার। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় জন্মে নয় কর্ম কীর্তিতে। তার বিদ্যাবত্তা, উদারতা, বিশ্বমুখীন চেতনা কালের সীমাবদ্ধতাকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বত্তম মানুষের কাছে প্রিয়তম মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। এই অতিসত্য উক্তি শুধু মাত্র মহান ব্যক্তিরা অনুধাবন করতে পারেন তাঁর মহত্ত্ব!

তাঁর নীরব মহা প্রয়ানে আমাদের অপূরনীয় ক্ষতি হলো। পালি ভাষা ও সাহিত্য জগতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন আগামী। পালি ভাষায় তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী নিরবিছিচন্ন ভাবে সৃষ্টি করে গেছেন। আমি মনে করি দুই বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি, যোগাযোগ ও উন্নয়ন চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের পূর্ব পরিকল্পিত........।

১১। শ্রী বিজয় কেতন চকমা, হস্তীদন্ত কারুশিল্পী, কল্পতরু, রাঙ্গামাটি।

"পার্বত্য ভিক্ষু সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি নামে দুইটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পার্বত্য ভিক্ষু সমিতি ভিক্ষুসংঘকে অনুশাসন ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা এবং

পার্বত্য বৌদ্ধ সমিতি– দায়ক-দায়িকা সদ্ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষা, শান্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের প্রথম কর্ম সূচনা। পার্বত্য বৌদ্ধ সমিতি ১৪ মার্চ ১৯৭৩ খ্রিঃ থেকে সাধারন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপালন করে শ্রদ্ধেয় ভান্তের সাথে এ জেলায় আনাচে- কানাচে বহু ঘুরেছি। একমাত্র তারই আশীর্বাদে অতি দরিদ্র হতভাগ্য জনগণকে অতি নিকট হতে দেখার জানার সুযোগ করেছি। তারই সহগামী হয়ে বড় বড় বহু ধর্মসভায় সমিতির উদ্দেশ্য লক্ষ্য পরিকল্পনা তুলে ধরেছি। ভিক্ষু অগ্রবংশ ব্রহ্মদেশে ধর্মীয় শিক্ষা, ধ্যান, ভাবনা অনুশীলনের পর স্বদেশ স্বজাতির নিকট ফিরে সধর্ম্মের আলোর মশাল জালানোর জন্য পাবর্ত্য জনপদের একটির পর একটি ক্যাং (বৌদ্ধ বিহার) প্রতিষ্ঠার অনুপ্রাণিত করলেন। বন্দনা, শীল, সংঘদান, কঠিনচীবর দান দানোৎসব সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য উৎসব মেলা সৃষ্টি করলেন। সাথে সাথে প্রাচীন প্রথা রাউলী বা লুরী ধর্মকাম বিভিন্ন কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হতে লাগল..........।

১২। বিপ্রদাস বড়ুয়া, নিসর্গ প্রেমিক ও সাহিত্যিক, ঢাকা

"বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশ করে রাণী কালিন্দী বড়ুয়া মারমা জাতির অশেষ উপকার সাধন করেন। একই কাজটি অতিশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত বাসীর জন্য কীর্তি স্থাপন করেন। তারপরও চাকমাদের মধ্যে বৌদ্ধবিহারের সংখ্যা আশানুরূপ করেনি। সেই জোয়ার আসে ১৯৫৮ সালে ভিক্ষু অগ্রবংশ স্থবিরের রাজগুরু রূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরথেকে। ১৯৭৩ সাল নিখিল ভারত বৌদ্ধ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে একদিন সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে ৩ দিনের সম্মেলনে এবং ১৯৭৭ সালে নেপাল অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সাল হল্যান্ড অনুষ্ঠিত

মানবাধিকার সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন। ১৯৮৫ সালে ২ আগষ্টে জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতি সঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে যোগদানে আমন্ত্রন পান। সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্রদের অবর্ণনীয় দূর্দশার কথা তুলে ধরেন। এসময় থেকে তিনি যুক্তরাজ্য, জার্মানি, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপাল প্রভৃতি দেশে দিয়ে মানবতা, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ, ভারতের মহাবোধি সোসাইটি কলিঙ্গানিম্পন বৌদ্ধসংঘ, জাপান বার্মার ইউনিয়ন বুদ্ধশাসন কাউন্সিল, কলম্বো যুব বৌদ্ধ সমিতি, বার্মা বৌদ্ধ ওর্য়াল্ড মিশন, লন্ডন বৌদ্ধ সমিতি এবং নিখিল ভারত বেঙ্গঁল বুড্ডিষ্ট এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "পন্ডিত" আখ্যায় ভূষিত করেন। তিনি ভিজিটিং প্রফেসর এবং পি. এইচ.ডি অতি সন্দর্ভের এটারন্যাল এজামিনার নির্বাচিত হন। তিনি "শিশু করুনা সংঘ" কলিকাতা এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন।

কোনো মানুষ তার জন্ম এবং মৃত্যুর সময় মনে করতে পারে না।
সে শুধু পারে মৃত্যুর জন্য কাঁদতে। মৃত্যুর আগে মৃত্যুর
কথা ভেবে কাঁদতে। মানুষ আসলে মরে না সে শুধু
বেঁচে থাকে। বাঁচার গান রচনা করে। বাঁচার
জন্য জন্ম নেয়..........।

যে ব্যক্তি ধ্যানী, সাধক, ধুতাংগধারী, ভাবনাকারী,
মার্গলাভী, নাহয়েও এমন মিথ্যা প্রচারে,
নিজেকে ধার্মিক সেজে নিজের ইচ্ছা পুরণ করে থাকে
এবং অপরদেরকে শিক্ষা দেয়, জেনে রাখুন--তাদের দর্শনে অমঙ্গল।

তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষুদের কৃতিত্ব ও অবদান

ভিক্ষু অগ্রবংশ মহাস্থবির তাঁর মহাজ্ঞানদীপ্ত প্রতিভা ও পার্বত্য অঞ্চলে অসাধারণ অবদানের বিষয়ক প্রসঙ্গ অনস্বীকার্য। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে মনে পড়ে তাঁরই আগে এবং পরে আরও তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ভিক্ষু আর্বিভাব হয়েছিলেন। কর্ণফূলী নদীর কাপ্তাই বাঁধের (১৯৬০ ইং) আগে যাঁরা গৃহত্যাগী হয়ে ভিক্ষু হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ভিক্ষুর নাম ও পরিচিতি উল্লেখ করলাম। চিরতরে মুছে যাওয়া সেই কৃতিত্বপূর্ণ ভিক্ষুদের শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি। তাদের সাধনা ও পূণ্যময় কর্ম সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সকলের মনে-প্রাণে জাগরূক হয়ে থাকুক। তোমাদেরকে স্মরণ করে দিলাম ঃ----

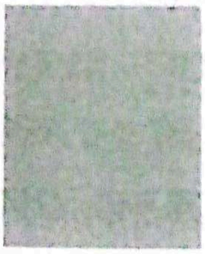

১। ভিক্ষু প্রিয়রত্ন মহাস্থবির, গৃহীর নাম পালক ধন তঞ্চঙ্গ্যা।

জন্মের পর মাতা মৃত্যু হলে তাকে চাকমা মহিলা পালন করে, বড় করেছিলেন বলে নাম পালক ধন। তিনি তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে এবং ১০০নং হোয়াগ্গা মৌজায় জন্ম গ্রহন করেন। বড় হয়ে কোন এক বড়ুয়া ভিক্ষুর নিকট প্রবজ্যা গ্রহন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ভিক্ষু হয়ে নাম করণ হয় ভিক্ষু প্রিয়রত্ন। চট্টগ্রামে কোন এক ক্যাং ঘরে কয়েক বৎসর থাকার পর শ্রীলংকা অনুরাধাপুরে গমন করেন। সেই দেশের ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় তার পান্ডিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজবিহারে অবস্থান করার অনুরোধ করেন এবং রাজগুরু পদবী ধারন করেন। তৎসময়ে রাজবাড়ীতে কাঁসর ঘন্টার বাজনা আর শঙ্খের

ধ্বনী সকাল-সন্ধ্যা শোনা যেত। সনাতনী প্রথায় পূজা পার্বন পালন করা হত। কেননা রাজ মহিয়সী ছিলেন খাঁটি হিন্দু রমণী। এরপরও চাকমা সার্কেলে স্বেচ্ছাচারী লুরী বা রাউলী পুরহিতদের মিথ্যাচার ধর্মে পরিপূর্ণতা ছিল। এই কারণে ধর্ম প্রচারে তাঁকে একাধিক বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে শোনা গিয়েছে। তিনি সিংহলী লেখা পড়তে, লিখতে এবং বুঝতে পারতেন। শ্রীবুধখাজংজী কর্তৃক হস্ত লিখিত অবোধ্য ও অনুচ্ছারিত "আগরতারা" ভিক্ষু প্রিয়রত্ন সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ১৯৫৪ইং সালে মৃত্যু বরন করেন।

২। ভিক্ষু চিত্তানন্দ মহাস্থবির, গৃহীর নাম যতীন তঞ্চঙ্গ্যা।

জন্ম ১৯১১ইং রাঙামাটি সদরের সন্নিকট মানিকছড়ি নামক মৌজায়। তিনি আধ্যাত্মিক উবাগীতের গায়ক ও রাজগীংখুলী নামে প্রসিদ্ধ শ্রীজয়চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গীংখুলী) এর পৌত্র। যতীন তঞ্চঙ্গ্যা নিজে একজন গীংখুলী হিসাবে বিষু, নয়াভাত, পোই ইত্যাদি উৎসবে বহুবার উবাগীত গেয়ে পরিচিতি হন। তার পত্নী অকালে মৃত্যু বরন করলে তিনি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন এবং তাঁর নামকরণ হয় ভিক্ষু চিত্তানন্দ। তিনি পার্বত্য ভিক্ষু সমিতির সদস্য হিসাবে দয়া, সেবা ও কর্মতৎপরতার যোগ্যতা অর্জন করে জুরছড়ি এলাকায় ক্যাং নির্মাণ করে সেখানে বাস করেন। সেখান থেকে কাচলং অভিমূখে গিয়ে মানুষকে সদ্ধধর্মের বাণী প্রচার করে মানুষকে দিতে পেরেছেন সত্যের বাণী। মারিশ্যার জীবতলী জেতবন বিহার, রূপকারী ইউনিয়নের করঙ্গাতলীতে বৌদ্ধ বিহার, সিজক মুখ বৌদ্ধ বিহার, বাঘাইছড়ি সুরমা মন্দির নির্মাণ একমাত্র ভিক্ষু চিত্তানন্দের মহান সাফল্য ও অবদান। তিনি নিঃস্বার্থবাদী ও পরপোকারী হয়ে নিজ জন্ম স্থানে বৌদ্ধ বিহার শূন্যতা অনুভব করলেন। অতঃপর স্বজাতির জন্য মানিকছড়ি ও আগোইয়াছড়ি দুটি বিহার নির্মাণ করে

থাইল্যান্ড অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করে দিলেন। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বিনয়াচার্য ও সুলেখক ভিক্ষু জিনবংশ মহাস্থবিরের "নির্মাল্য হিতোপদেশ" এবং রাজগুরু অগ্রবংশ ভান্তের কয়েকটি পুস্তিকা নিজ অর্থ ব্যয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গরীব ছেলে-মেয়ে পড়া লেখার আর্থিক সাহায্য তার ভিক্ষু জীবনে প্রধান অসাধারণত্ব। ১৯৯৩ইং সনে মৃত্যুবরন করেন।

৩। ভিক্ষু ক্ষেমংকর মহাস্থবির, গৃহীর নাম তালেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা।

রাঙামাটি সদর মহকুমাধীন ১২১নং কাঙ্গাড়াছড়ি মৌজায় ১৯১৮ইং সনে স্বচ্ছল ও ধার্মিক পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। ফর্সা, শান্ত সদা হাস্যজ্জ্বল তালেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামের এম.ই স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে শ্রমণ হন। অতপর বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ধর্ম্মাংকুর বুড্ডিষ্ট টেম্পলে চলে যান। পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের নিকট শিষ্য গ্রহন করেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে পায়ে হেঁটে ১৯৪৮ইং রেঙ্গুঁন গমন করেন। রেঙ্গুঁন পাত্তান ক্যাং নামে প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্মীজ ভাষা, ধর্মীয় পুস্তক ও দর্শন শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। এরপর অংমালা-পালি কলেজ থেকে পাঁচ বৎসর অভিধর্ম বিভাগে ব্যুৎপত্তি লাভ করে উপাধিপত্র লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয় বিষয়ে অনর্গল মূখস্থ বলতে পারায় ভিক্ষু সংঘের অন্তরে এবং সকল সদ্ধর্ম বিশ্লেষকদের কাছে শ্রুতিধর হিসাবে অভিনন্দিত ছিলেন। ১৯৬০ইং কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই বাঁধের বাড়ী, জমি সব জলে মগ্ন হবার ফলে হাজার হাজার পরিবার ইতস্তত আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেশির ভাগ পরিবার বহু দূরে চলে যান। এই সংবাদে তিনি জ্ঞাতির সন্ধানে রেঙ্গুঁন থেকে জন্মভূমিতে চলে আসেন। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের আমন্ত্রনে তিনি চট্টগ্রামের রাজানগর রাজবিহারে রাজগুরু পদমর্যাদায় দায়িত্ব পালন করেন। এরপর হোয়াগ্গা মৌজার হেডম্যান

পাড়া বৌদ্ধ বিহারে স্থিতিশীলভাবে বসবাস করেন। তাঁর আশ্রয় ও আর্থিক সহযোগিতায় বহু ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা সুবিধা করার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বার্ধক্য বয়সে তিনি চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেট্রিক পরীক্ষায় ২য় বিভাগে পাশ করেন। বাংলা ছাড়াও পালি, বার্মিজ, ইংরেজী বুঝতে, পড়তে ও লিখতে পারতেন। বার্মিজ লেখার ত্রিপিটকের পালি পুস্তক অনুবাদ করে তাঁর প্রকাশিত পুস্তক ঃ- (১) মাটিকা ধাতু কথা, (২) ধর্ম সংগিনী, (৩) বিভঙ্গ ও জিনাত্তা, (৪) যমজ স্বরুপিনী, (৫) সতিকা ধাতু কথা, (৬) চলার পথে, পুস্তক বিশ্লেষকদের কাছে খুবই প্রশংসিত। এছাড়া বহু পান্ডুলিপি সম্পন্ন করে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর ভিক্ষুত্ব ওয়া বা বর্ষাবাস ৪৭টি হলে ৮৪ বৎসর বয়সে ২০০২ সালে পরলোক গমন করেন।

৪। ভিক্ষু আচার মহাস্থবির, জন্মের পর বাবা-মা দেয়া নাম বাচন তঞ্চঙ্গ্যা।

বাল্যকালে ব্রাক্ষণ পন্ডিতের নিকট গ্রামের টোলে লেখা পড়া করেছিলেন। রাইংখ্যং নদীর তীরবর্তী ১২০নং ছাক্রাছড়ি মৌজার বগলতলী বৌদ্ধ বিহারের মগ ভান্তে উঃ তিষ্য মহাস্থবির এর নিকট উপসম্পদা গ্রহন করেন। ভিক্ষু হয়ে ১৯২৭ ইং সালে কলিকাতা ধর্মাংকুর বুড্ডিষ্ট টেম্পলে কয়েক বৎসর ধর্ম শিক্ষা গ্রহন করেন। ১৯৩৩ সালে শ্রীলংকা গমন করে "আকালে ওয়ার্তে" নামক প্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ত্রিপিটকের শিক্ষা চার বৎসর মনোনিবেশ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ভাবনা বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৫৪-১৯৫৭ইং পর্যন্ত রাঙ্গামাটি রাজ বিহারে রাজগুরু পদবী সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই বাঁধের ফলে কিছু সংখ্যক স্বজাতিরা উদ্বাস্থ হয়ে বান্দরবানের

বালাঘাটা মৌজায় পুনর্বসতি স্থাপন করেন। তথায় কয়েক বৎসর কাটানোর পর রাইখ্যং নদীর তীরবর্তী বল্লালছড়া মৌজার গ্রামের নিজ এলাকায় বৌদ্ধ বিহারে বার্ধক্য জীবন কাটান। অবিবাহিত, সদাহস্যজ্জ্বল, ত্যাগী, কঠোর সংযম, শীলবান, পরোপকারী আর সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর জীবন। বাংলা ছাড়াও সিংহলী ভাষার দক্ষতা ছিল। তিনি ২০০৪ইং সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর ভিক্ষু জীবনে ৬৪ ওয়া বা বর্ষাবাস ছিল।

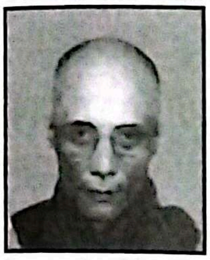

৫। ভিক্ষু আর্যানন্দ মহাস্থবির, গৃহী নাম পিবোই চান তঞ্চঙ্গ্যা।

জন্ম– ১৯৪১ ইং সনে রাইংখ্যং ঘিলা মইন পাহাড়ের পাদদেশে নারদমনি তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ায়। বাল্যকালে রামসুন্দর বসাকের "বাল্যশিক্ষা" বই শেষ করে তাঁর ভগ্নিপতি কবিরত্ন কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা সহযোগিতায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। বাব–মা ধার্মিক এবং সৎ ছিলেন বলে পিবোই চান তঞ্চঙ্গ্যা বাল্যকাল থেকেই গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং মান্যতা পরিলক্ষিত হয়। যৌবনের উষালগ্নে ভোগৈশ্বর্যে এবং মায়া মরিচিকাময় জীবন অনুভব করে ভগ্নিপতি কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার সহায়তায় প্রবজ্যা লাভ করে নাম রাখা হয় আর্যানন্দ শ্রামণ। তিনি উপযুক্ত আচর্যের সহচর্যের জন্য লামা, আলীকদম, উখিয়া সহ কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেছিলেন। ১৯৬০ ইং সনে ভিক্ষু হন পরম পুরুষ অভিধর্মচার্য ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎ ক্ষেমংকর মহাস্থবিরের উপাধায়ত্বে।

এরপর কাউখালী উপজেলাধীন রস্যাবিলি গ্রামে একটি কুঠির তৈরী করে সেখানে অবস্থান করেন। দুই বৎসর গভীর বনে বিদর্শন ভাবনা এবং ধুতাংগব্রত পালনের পর বুঝতে পারলেন শুধু আত্মশুদ্ধি নয়, "সেবাই পরম ধর্ম"। তিনি রাজগুরু অগ্রবংশ

মহাস্থবির, বিদ্যারত্ন সুবিমল মহাস্থবির, পন্ডিত সুগতবংশ মহাস্থবির, ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির সহ বহু মহাজ্ঞান তপস্বীদের সংশ্রবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ধর্মের মনীষা, আজীবন ব্রহ্মচারী, সুবক্তা, চট্টগ্রামের পদুয়া শাক্যমুনি বিহারের অধ্যক্ষ, রাঙ্গুনীয়া সংঘরাজ সহাসভার সহ-সভাপতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের "ত্রিরত্ন ভিক্ষু এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠাতা, "রাজগুরু অগ্রবংশ শিশু সদন" বিলাইছড়ি, প্রতিষ্ঠাতা। রেইচা পঞ্চবুদ্ধ অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠাতা। ভিক্ষু আর্যানন্দ মহাস্থবিরের আর্থিক সহযোগিতায় বহু শ্রামণ-ভিক্ষু, বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কিংবা পড়ালিখার সুযোগ লাভ করার জন্য সত্যিই তিনি এক মহান দাতা। তার জীবনে সবচেয়ে বড়গুণ হল, তিনি শীলবান, সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। তার মতো নির্লোভ, নিরহংকার, নম্রতা আর চরিত্রের বৈশিষ্ঠ্যতা বর্তমান সহজে দৃষ্টাদৃষ্ট হয় না। তিনি ২০05 ইং সালে পরলোক গমণ করেন।

***

পরস্পরকে বঞ্চনা করোনা, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা করোনা। কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা করো না।

---- তথাগত বুদ্ধ

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন তথ্য ঃ

* জন্ম ঃ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। রাইংখ্যং নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ১২২ নং কুতুবদিয়া মৌজা, রাঙামাটি সদর মহকুমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

* উদ্বাস্থ ঃ ১৯৬০ ইং কর্ণফুলি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট (কাপ্তাই বাঁধ) হয়। ৫২ একর ১ম শ্রেণী ধানের জমি, ঘর ডুবে যায়। ফলে বান্দরবান সদর মহকুমাধীন ৩৩৭ নং বালাঘাটা মৌজায় পুণবসতি স্থাপন।

* কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি প্রদর্শনী, বান্দরবান উপলক্ষে একক চিত্র প্রদর্শনী ও পুরস্কৃত– ১৯৬৩ ইং।

* পত্নী বিয়োগ। অকস্মাৎ নেমে আসে কঠিন দুঃসময়– ১৯৬৮ ইং।

* চাকুরী– কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর এর কার্যালয়ে জরীপ ও বন্দোবস্তী শাখার সরকারী আমিন– ১৯৬৯ ইং। চাকুরী কালে টাকা ঘুষ নেয়া কিংবা প্রলোভিত নাকরা ছিল প্রধান বিশেষত্ব। শত শত লোক ভূমি বন্দোবস্তি দিতে ৭/৮ বৎসর পার্বত্য জেলায় মফস্বল।

* বাংলাদেশ পালি ও সংস্কৃতি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা অধীনে ত্রিপিটকের সূত্রআদ্য, সূত্রমধ্য ও সূত্র উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ– ১৯৭০ ইং।

* শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) কর্তৃক "বিশ্বকর্মা" উপাধি প্রদান– ১৯৭৮ ইং।

* একক প্রচেষ্ঠায়– "রাঙামাটি চারুকলা একাডেমী" প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও অধ্যক্ষ। বলাবাহুল্য– ইহা তিন পার্বত্য জেলার সর্বপ্রথম চিত্রকলা বিষয়ক অপ্রতিদন্ধী প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীরা

চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় শতাধিক জাতীয় (ঢাকা), আন্তর্জাতিক ৩ টি এবং ১ টি জাতিসংঘের পুরস্কার লাভ করে কৃতিত্বে অগ্রগামী। স্থাপিত– ১৯৭৯ ইং।

* বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে চিত্রকলায় অবদানের জন্য "সংবর্ধনা"। বঙ্গভবন, ঢাকা– ১লা জানুয়ারী, ১৯৮১ ইং।

* চারুকলা বিষয়ক পুস্তক "চিত্রা"। প্রকাশনা– ১৯৮৬ ইং।

* সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন ও জেলার উচ্চ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে চিত্রকলা এবং শিশু সংগঠক হিসেবে "সংবর্ধনা"– খাগড়াছড়ি– ১৯৮৮ ইং।

* চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় কর্তৃক চিত্রকলায় অসামান্য অবদানের জন্য গুণীজন "সংবর্ধনা"– ১৯৯০ ইং।

* "বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যান সমিতি" এর প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত "তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি" পুস্তক (মূল পান্ডুলিপি) বান্দরবান– ১৯৯৫ ইং।

* "তঞ্চঙ্গ্যা জাতি" ২য় সংখ্যা– ২০০০ ইং।

* তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা ও বাংলা গান "গীত পোই"– ২০০৪ ইং।

* "সদস্য"– জেলা পরিষদ, রাঙামাটি (নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার– ২০০৭ ইং।

* মোবাইল ফোন চালু। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্ঠা ডঃ ফকরুদ্দিন আহমদ ও সরকারী পর্যায়ে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ সস্ত্রীক রাঙামাটি আগমণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোন চালু করার জন্য প্রধান উপদেষ্ঠার পত্নীর কাছে মৌখিক ভাবে দাবী করা হলে তিনি সম্মত হন এবং প্রতিশ্রুতি মতে বিশ দিনের মধ্যে মোবাইল ফোন পার্বত্য অঞ্চলে চালু করে

দিয়েছিলেন। এমন দুরূহ কাজ সমাধা। যাদুঘর, রাঙামাটি। ফটো সহযোগিতায়- সুপ্রিয় চাকমা, দৈনিক প্রথম আলো- ২৭শে মার্চ, ২০০৮ ইং।

* বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারোয়া ভগা এলাকায় ইঁদুর বন্যায় ভীষম দুর্ভিক্ষকালে নিজ হাতে ৪ লক্ষ টাকা ও ৫০০ শত কম্বল বিতরণ।

* চিত্রকলা বিষয়ক পুস্তক "চারুকলা অনুশীলন"- ২০১১ ইং।

* জীবনী ঃ "আত্মচরিতাবলী"- ২০১২ ইং।

* ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মনুগাঙ থেকে প্রকাশিত তঞ্চঙ্গে- আনক্যে এক তোলোয়্যত্ বোজিবার ধারাজে "বিঝু নিজেনি" সংকলনে রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা রচিত পুস্তক থেকে কিছু অংশ পুণঃ প্রকাশ- ২০১২ খ্রিঃ।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব ডঃ রণজিত কুমার বিশ্বাস কর্তৃক চিত্রকলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অস-ামান্য অবদানের জন্য "আজীবন সম্মাননা" প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান- ২০১৫ ইং।

* শিল্পী ও লেখক হিসাবে ভারতের আসাম প্রদেশের গৌহাটি শহরে সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ- ২০১৪ খ্রিঃ।

* রাঙামাটি পার্বত্য জেলার উচ্চ পর্যায়ে জেলা সরকারী ও বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কর্তৃক চিত্রকলায় অভূতপূর্ব অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান। আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, রাঙামাটি- ২০১৬ ইং।

* তথ্ঞঙ্গ্যা, চাকমা ও বাংলা গানের গীতিকার স্বীকৃতি। বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি।

* সরকারী/বেসরকারী/দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদান ছাড়া বহু বাধার পর বাধা অতিক্রম এবং অভাবের মধ্যে পরিচালিত চারুকলা একাডেমীতে চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্য প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। দেশবরণ্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদের আগমনে রাঙামাটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

* রাঙামাটি চারুকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ যাবৎ একাডেমীতে ১১ জন জেলা প্রশাসক এসেছিলেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, খুবই প্রশংসা লাভ করেছি– কিন্তু আর্থিক, উন্নতি ও সহায়তার অভাব ছিল।

* ১লা জুলাই ২০১১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা এর আয়োজনে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে ৫দিন ব্যাপী ‘‘চারুকলা প্রদর্শনী” অনুষ্ঠিত হয়। ‘‘রাঙ্গামাটি চারুকলা একাডেমী” ভবনে। এতে দেশের বিভিন্ন শিল্পী নাট্যব্যক্তিত্ব ছাড়াও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসন ও সংসদ সদস্য উপস্থি ছিলেন। প্রদর্শনী উপলক্ষে চারশতের অধিক শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা হয়।

* তিন পার্বত্য জেলায় সর্ব প্রথম চারুকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে শিশু কিশোরদের ৪০ বৎসর একটানা টিকে রাখা এই প্রতিষ্ঠানে চিত্রাংকন, সংগীত ও নৃত্য অব্যাহত রয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে শত শত শিক্ষার্থী, দেশে–বিদেশে বহু উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্প শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া
এবং সুভাষিত বাক্য বলা-ইহাই উত্তম মঙ্গল।

--- তথাগত বুদ্ধ

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

১। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম উত্থান পতন– মহাপন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ।

২। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম – ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী এম এ ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। বাংলাদেশের বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য– সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৪। দীপ্তি– চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ স্মারক, রাঙ্গামাটি।

৫। চাকমা জাতির ইতিহাস– বিরাজ মোহন দেওয়ান।

৬। চাকমা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ধর্মশালা বুদ্ধগয়া – রাঙ্গামাটি।

৭। চাকমা জাতি– সতীশ চন্দ্র ঘোষ, ১৯০৯ ইং।

৮। জগজ্যোতি– কৃপাচরণ মহাস্থবির, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার কলিকাতা ।

৯। শজ্ঞশক্তি– প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, কান্দগ্লে রেঙ্গুন।

লেখকের প্রকাশিত পুস্তক ঃ

* চিত্রা
* তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি (মূল পাণ্ডুলিপি)
* তঞ্চঙ্গ্যা জাতি
* গীত পোই
* আত্ম চরিতাবলী
* চারুকলা অনুশীলন
* আলোকিত তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণা ঘন ধরণী তল, কর কলংঙ্ক শূণ্য

--- বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা

অ[illegible]্যা

শিল্পীর পরিবার